# সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে
# সাঁওতালি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

ভাষা বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী ভারতবর্ষের ভাষাগুলি চারটি ভাষাগোষ্ঠী থেকে এসেছে। এগুলি হল - ভোটচীনীয়, দ্রাবিড়ীয়, ইন্দো-ইউরোপীয় এবং অষ্ট্রো এশিয়াটিক।

**ভোটচীনীয় ঃ**

এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলিতে বসবাস করেন। যেমন-নাগা, মিজো, বোড়ো, লেপচা, ভুটিয়া, মনিপুরী-এগুলি হলো ভোটচীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা।

**দ্রাবিড়ীয় ঃ**

আর্যগণ ভারতবর্ষে আসার আগেই দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এদেশে আসেন। মধ্য ভারত ও ভারতের দক্ষিণাংশে এই ভাষাভাষীর মানুষ বসবাস করেন। দক্ষিণাংশের ভাষাগুলি হলো-তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম এবং মধ্যভারতের ভাষাগুলি হল - গোন্দ, ভীল, কুরুখ। এই ভাষাগুলি হলো দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা।

**ইন্দো-ইউরোপীয় ঃ**

ইতিহাস থেকে জানা যায়, মধ্য-এশিয়া অঞ্চল থেকে আর্য-ভাষাভাষীর মানুষ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। এই আর্য-ভাষা থেকে যে সব ভারতীয় ভাষার সৃষ্টি হয়-সেগুলিই হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা। যেমন-গুজরাটি, মারাঠী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, বাংলা, অসমীয়া।

**অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ঃ**

ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ভাষা যেমন সাঁওতালি, মুণ্ডারী, হো, কোড়া, খেড়িয়া ইত্যাদি এগুলি হলো অষ্ট্রো এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা।

বর্তমানে একশত পঁচিশ কোটিরও বেশি মানুষ ভারতবর্ষে বসবাস করেন। জর্জ গ্রীয়ারসন দেখিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে ৫৭২টি ভাষা রয়েছে। ১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী, দশহাজারের বেশি মানুষ কথা বলেন এমন ভাষার সংখ্যা ২২১টি। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ কথা বলেন এমন ভাষার সংখ্যা ১১৭টি।

অষ্ট্রো এশিয়াটিক শাখার প্রধান চারটি ভাষাগোষ্ঠী হল-নিকোবরী, খাসিয়া, মনখমের এবং মুন্ডারী। মুন্ডারী গোষ্ঠীর ভাষাসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল খেরওয়াড়ী ভাষাসমূহ এবং অপরটি হল অ-খেরওয়াড়ী ভাষা সমূহ। অ-খেরওয়াড়ী ভাষাগুলি হল-খাড়িয়া, শবর, নিহালী, গাদাবা ইত্যাদি। খেরওয়াড়ী ভাষাগুলি হল-কোরওয়া, অসুর, তুরি, হো, কোড়া, বিরহড়, ভূমিজ, মুন্ডারী, মাহালী, কুরমালী এবং সাঁওতালি।

ভারতবর্ষে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতাল জনসংখ্যাই বেশী। জনসংখ্যার নিরিখে ভারতবর্ষে সাঁওতালি ভাষার স্থান ত্রয়োদশ তম। ভারতবর্ষের বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্যে কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে আবার কোথাও বা বিশাল অঞ্চলজুড়ে সাঁওতালদের বাসভূমি। দুই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও নেপালেও সাঁওতালি ভাষার মানুষজন রয়েছেন।

সাঁওতালি একটি প্রাচীন ভাষা। সাম্প্রতিক কালের ভাষাবিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাঁওতালি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সংস্কৃতজাত ভারতীয় ভাষাগুলির দেশি শব্দের প্রায় ষাট শতাংশ সাঁওতালি শব্দ থেকেই গৃহীত বা উদ্ভুত। সুতরাং সাঁওতালি ভাষা যে প্রাচীনতম তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে ইদানীংকালে সাঁওতালি ভাষার মৌলিকত্ব নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক দেখা দিয়েছে কেননা বিবর্তনের পথে বিভিন্ন ভাষার শব্দ যেমন সাঁওতালিতে আশ্রয় নিয়েছে তেমনি সাঁওতালির বহু শব্দ অন্যকে দান করেছে। বলা ভালো, আত্মীকরণ ঘটেছে। যেমন-যে সমস্ত সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে বাংলাভাষার প্রাধান্য রয়েছে সেখানে বাংলা শব্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে হিন্দী, ওড়িয়া, অসমিয়া শব্দের প্রচলন সাঁওতালি ভাষায় রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রভাবকে স্বীকার করা গেলেও প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করলে দেখা যাবে। সাঁওতালিতে ব্যবহৃত অন্য ভাষার শব্দগুলো প্রকৃত অর্থে সাঁওতালিই।

মুসলমান রাজত্বে সাঁওতালি ভাষার প্রতি কোনরকম পদক্ষেপ নেবার কথা জানা যায় না। সাঁওতালদের প্রতি মুঘল সম্রাটদের মানসিকতার পরিচয়ও জানা যায় না। হয়তো মাত্রাতিরিক্ত তাচ্ছিল্যের ভাষা হিসাবে মনে করা হত বলেই এ নিয়ে কেউই তেমন উৎসাহ দেখাননি বা কেউই গুরুত্ব দেননি। তবে হিন্দু রাজা বা জমিদারদের সামান্য উৎসাহের ইঙ্গিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায়। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলের রাজা বা জমিদার অনেক সময় স্থানীয় সাঁওতাল সঙ্গীত শিল্পীদের গান শোনানোর জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। শিল্পীরাও নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রসহ হাজির হতেন সঙ্গীত সভায়।

নিজস্ব ভঙ্গী ও শৈলী অনুযায়ী রাজা বা জমিদারকে তাঁরা গান পরিবেশন করে শোনাতেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য রাজা বা জমিদার বাংলা (তৎকালনী আঞ্চলিক বাংলা) হওয়াতে সাঁওতাল সঙ্গীত শিল্পীরা রাজা বা জমিদারের বোঝার জন্য সাঁওতালি ভাষার গানে বাংলা শব্দের ব্যবহার করতেন। এভাবেই সাঁওতালি গানে প্রচুর বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং এখনও বাংলা শব্দ মিশ্রিত প্রচুর সাঁওতালি গান সাঁওতালদের মধ্যে Traditional গান হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে। বাংলা মিশ্রণের আগে প্রকৃত সাঁওতালি শব্দের ব্যবহার কেমন ছিল তা জানা যায় না। যাই হোক, সাঁওতালি ভাষার প্রতি এর বেশী বদান্যতার কথা জানা যায় না। বড়জোর রাজা বা জমিদারের পক্ষ থেকে সঙ্গীত শিল্পীদের কিছু পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু ভাষার চর্চা বা বিকাশের জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ বা কৃপাদৃষ্টির ইতিহাস জানা যায় না।

সাঁওতালি ভাষার প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন খ্রীশ্চান মিশনারীগণ উনবিংশ শতাব্দীতে। বাইবেল প্রচার তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও মিশনারীগণই প্রথম অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সাঁওতালি ভাষার মধ্যে জীবনীশক্তি রয়েছে, এই ভাষার মৌখিক সাহিত্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত বৈচিত্র্যময় ও একটা জাতির মনঃচেতনার পরিচয় এর মধ্যে রয়েছে। ফলে অনেক মিশনারীগণ সাঁওতাল গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাঁওতালদের সঙ্গে মিশে সাঁওতালি ভাষা শিখে এই ভাষার চর্চা ও উন্নয়নমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, মিশনারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতার ফলেই সাঁওতালি ভাষা অন্ধকারের রুদ্ধ কক্ষ থেকে আলোর পথে আসে। বিনিময়ে কিছুসংখ্যক সাঁওতালদের হারাতে হয়েছে নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির মৌলিকত্ব তবু সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রে মিশনারীগণই আলোকপথের দিশারী একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত সাঁওতালদের মধ্যে তাঁরাই শিক্ষার আলো পেয়েছেন যাঁরা খৃষ্ট ধর্মকে আপন করে নিয়েছিলেন। ফলে ভাষা চর্চাও সীমিত ছিল খৃষ্টধর্মাবলম্বী সাঁওতালদের মধ্যে। অবশ্য যৎসামান্য ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। খৃষ্ট ধর্মকে গ্রহণ করেননি এমন সাঁওতালদের মধ্যেও ভাষা চর্চা ছিল তবে তা হাতে গোনা মাত্র। আসলে খৃষ্টধর্মাবলম্বী সাঁওতালদের বাইরে যে বিশাল সংখ্যক সাঁওতাল ছিলেন তাঁরা নিরক্ষর হওয়ায় এবং তাঁদের কাছে বেঁচে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়ায় ভাষা চর্চা বা বিকাশ সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না। অ-সাঁওতাল সম্প্রদায়ের তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত মানুষ

খৃশ্চান সাঁওতালদের যৎসামান্য সমীহের চোখে দেখলেও, প্রকৃত সাঁওতালদের তাঁরা মানুষ হিসেবে কোনদিনই গণ্য করেনি। তাই তাঁরা সাঁওতালি ভাষাকে "ঠার" বলে ব্যঙ্গ করতেন। "ঠার" অর্থে জন্তুজানোয়ার পশুপক্ষীদের ভাষা। অ-সাঁওতালদের এই মানসিকতার ছাপ সাঁওতালদের প্রতি আচার-আচরণে, কথাবার্তায় প্রকাশ পেত ফলে সাঁওতালরা হীনমন্যতার শিকার হত। অন্যের সামনে নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলতে তারা লজ্জা বোধ করত।

সাঁওতালদের মধ্যে পড়াশুনার শুরু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে তাও খুবই কম। যাঁরা স্কুলে যেতেন তাঁরাও হীনমন্যতার কারণে সাঁওতালি ভাষায় কথা বলতে লজ্জাবোধ করতেন। অন্যদিকে অঞ্চলভেদে বলিষ্ঠ ভাষার প্রভাব সাঁওতালদের মধ্যে প্রবল থাকায় তাঁরা ঐ বলিষ্ঠ ভাষাকে আপন করার স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। যেমন-ওড়িয়া ভাষী অঞ্চলে ওড়িয়া, হিন্দী ভাষী অঞ্চলে হিন্দী, বাংলা ভাষী অঞ্চলে বাংলার প্রভাব সাঁওতালদের মধ্যে পড়ায় এই আঞ্চলিক ভাষাকে তাঁরা রপ্ত করতে বাধ্য হন কেননা দিকু বা অ-সাঁওতালদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমই হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা। কাজে কর্মে, হাটে-বাজারে সর্বত্র আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ছাড়া সাঁওতালদের চলত না। এ ভাবে ধীরে ধীরে সাঁওতালদের মধ্যে নিজস্ব ভাষার প্রতি ঘৃণা অবহেলা সৃষ্টি হয় এবং আঞ্চলিক ভাষাই হয়ে উঠে তাদের কাছে ধ্যান জ্ঞান। ফলে সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যেও আঞ্চলিক ভাষায় (বাংলা-হিন্দী-উড়িয়া) কথা বলা শুরু করে এবং তা বাহাদুরির কাজ বলে মনে করত।

এভাবে চল্লিশের দশক পর্যন্ত চলার পর ধীরে ধীরে অ-সাঁওতালদের নানা মানসিক লাঞ্ছনা, অবহেলা, তাচ্ছিল্য সত্ত্বেও এবং শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাব সত্ত্বেও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ স্কুলের দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়েছে, কেউ বা স্কুলের গণ্ডী পর্যন্ত কেউ বা গণ্ডী পেরিয়েছে। এঁরাই তৎকালীন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষ। এরই মাঝে কিছু মানুষের নেতৃত্বে নিজস্ব ভাষার প্রতি চরম উদাসীনতার প্রতি গণজাগরণ গড়ে উঠে। সাঁওতালি ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা আন্দোলন গড়ে তোলেন। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলন ছিল মুলত সাঁওতালি ভাষা চর্চা ও বিকাশের আন্দোলন।

**১৯৪৬-১৯৪৭ ঃ**

সাঁওতাল পরগণা থেকে যোসেফ সরকার সরেনের সম্পাদনায় "মারশাল তাবোন" পত্রিকার প্রকাশ। পলাশীর যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্ত যাবার পর ব্রিটিশ শাসন ক্রমশঃ অন্ধকারের মতো গ্রাস করল ভারতভূমিকে। সেই অন্ধকারে

রচিত হল অমানবিক শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনার ইতিহাস। সেই অন্ধকার থেকেই শোষিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত ভারতবাসী জেগে উঠল। অনেক আন্দোলন রক্তক্ষয় ঘটে গেল ভারতের মাটিতে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতের আকাশে দেখা দিল নতুন সূর্য্য। স্বাধীনতার সূর্য্য। স্বাধীনতা, বিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসীর কাছে স্বাধীনতা প্রাপ্তিই সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুদীর্ঘ ইংরেজ শাসন থেকে ভারতের পরাধনীতার শৃঙ্খল মোচনের অন্তরালে যে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে তাতে ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্যতম সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্বাধীনতাকাঙ্খী মানুষজনও সামিল ছিলেন একথা আজ ইতিহস স্বীকৃত।

**১৯৪৭ ঃ**

বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে ড. ডমন সাহু 'সমীর' সম্পাদিত সাঁওতালি পত্রিকা "হুড় সম্বাদ" এর প্রকাশ শুরু।

**১৯৪৮ ঃ**

স্বাধীন ভারতে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য সরকারীভাবে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারক S.K. Dhar এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। তার কারণ, ভারতবর্ষ জুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভাষা ভিত্তিক এলাকার চিহ্নিতকরণ চলছিল। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে সুষ্ঠুভাবে এবং স্থায়ীভাবে রাজ্যগঠনের জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়।

এ বছরই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভাষা ভিত্তিক রাজ্যগঠনের ব্যাপারটি পর্যালোচনা করার জন্য নতুন করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন-জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং পাট্টাভি সিতারামাইয়া। একে বলা হয় JVP কমিটি।

**১৯৪৯ ঃ**

গুঁড়ুরিয়া আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস এখনও জানা যায় না। জনশ্রুতি যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে সাঁওতালি ভাষার সম্পর্ক ছিল। যাইহোক, আন্দোলনের রূপরেখা মোটামুটি ভাবে এই রকম — ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের জন্য কমিটি গঠনের কথা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে পূর্ব ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর বৃহত্তম সম্প্রদায় সাঁওতালরা সাঁওতালি ভাষার ভিত্তিতে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবী জানান। বর্তমান বাংলা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যার বৃহৎ ভূ-

খণ্ডে সাঁওতালদের বসতি সুতরাং তাঁদের দাবা ন্যায়সঙ্গত তো বটেই স্বাধীন ভারতে এ তাঁদের অধিকারও বটে। কিন্তু তৎকালীন সরকার তাঁদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীকে গ্রাহ্য না করায় আন্দোলন দানা বাঁধে। অধিকার যেখানে খর্ব হয়, আন্দোলন সেখানে গড়ে উঠবেই। সুনারাম সরেনের নেতৃত্বে বাংলা, উড়িষ্যা এবং অধুনা ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল সম্প্রদায় দাবী আদায়ের জন্য গর্জে উঠে। উড়িষ্যার রায়রংপুর জেলার গুঁডুরিয়া মাঠে যা অধুনা ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা সীমানার কাছাকাছি, হাজার হাজার সাঁওতাল একত্রিত হয়ে দাবী জানান-ভাষা ভিত্তিক রাজ্যগঠনই যেখানে সরকারের কর্মপন্থা সেখানে সাঁওতালি ভাষার ভিত্তিতেও রাজ্য-গঠন হোক। দাবীর প্রতি বিবেচনা করা তো দূর অস্ত, সরকারের পক্ষ থেকে তা কর্ণপাতও করা হল না, বরং সরকারী পুলিশবাহিনী বিশাল মাঠকে ঘিরে নির্দেশানুযায়ী এলোপাথাড়ী গুলি চালায়। পালাবার পথ না থাকায় হাজার হাজার সাঁওতাল গুঁডুরিয়া মাঠে মৃত্যুবরণ করে। এ যেন দ্বিতীয় জালিয়ানওয়ালাবাগ। তফাৎ শুধু শাসক গোষ্ঠীর। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড পরাধীন ভারতের ঘটনা আর গুঁডুরিয়া মাঠের গণহত্যা স্বাধীন ভারতের ঘটনা। আশ্চর্য, ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনার কথা কোথাও লেখেননি। সাঁওতালি লোককথা, গানের মধ্যে এখনও বেঁচে রয়েছে এই নারকীয় ঘটনার কথা। এই আন্দোলনে আরো দুই নেতার নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন বর্তমান পশ্চিম সিংভূম জেলার রাজনগর অঞ্চলের দুই বন্ধু দেবা এবং কিষুন। এখনও এই দুই বন্ধুর অসীম সাহস ও আন্দোলনের কথা রাজনগর অঞ্চলের বৃদ্ধদের কাছ থেকে শোনা যায়। সাঁওতালদের ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রতিহত হলেও এই আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব পড়ে পরবর্তী সময়ের ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে।

**১৯৪৯ ঃ**

১৯৪৮ সালে গঠিত JVP কমিটি রিপোর্ট জমা দেয় ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে। তাতে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনকে বাতিল করা হয়। তবে একথাও বলা হল, জনগণের দাবীর ভিত্তিতে এই সমস্যার পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। "However the committee stated that the problem may be re-examined in the light of public demand."

**১৯৫২ ঃ**

ড. ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে তাঁর সাঁওতালি গ্রন্থ "সানতালি পারসি রেয়াঃ, মীন আর রমঞ্জ কাহ্নিকো" (সাঁওতালি ভাষার মান ও সরস গল্পগুচ্ছ) গ্রন্থে লিখেছেন —

"১৯৫২-৫৩ সাল রেয়াঃ কাথাএ লীই লেগে। ধার্তি জাকাৎ দসার মারাং লীড়হীই

রিপোর্টিং-

[ আদিবাসী জগৎ। ১৬ নভেম্বর ২০০০ ]

## সাঁওতালী ভাষাকে সংবিধানের ৮ম তপশীলে অন্তর্ভুক্তি ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে 'রাজভাষা' হিসাবে স্বীকৃতির দাবীতে রাঁচীতে বিরাট সাঁওতালী ভাষা র‍্যালী ও সমাবেশ

নুতন ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের প্রাক্কালে রাঁচীতে ৮ই নভেম্বর ২০০০ সাঁওতালি ভাষা র‍্যালী ও সমাবেশ এক নজির সৃষ্টি করে রাখলো। সাঁওতালী ভাষা মোর্চার ডাকে ভাষা র‍্যালী ও সমাবেশ সাম্প্রতিক কালে অন্যতম বৃহৎ। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা ও বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ৫ লক্ষেরও বেশী লোক সমাবেশে সমাগম হয়েছিল। বিভিন্ন ধরণের প্লাকার্ড, ফেষ্টুন ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে রাঁচী ষ্টেশন থেকে সকাল ৮টায় ভাষা র‍্যালী শুরু হয়। ৫ কি.মি. পথ পরিক্রমা করে র‍্যালী পৌঁছায় রাঁচির মুরাবাদী ময়দানে। র‍্যালীতে শ্লোগান ছিল অলচিকি লিপি ও সাঁওতালী ভাষাকে সংবিধানের ৮ম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যে সাঁওতালী ভাষাকে "রাজ্যভাষা" (State Language) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাঁওতালী ভাষা মোর্চার সভাপতি শ্রী সালখান মুরমু, পঃ বঃ আসেকার সভাপতি শ্রী কুশাল বাস্কে, সর্বভারতীয় মাঝি মাডওয়ার মাঝি শ্রী নিত্যানন্দ হেমব্রম, ডাঃ বি.বি. হেমব্রম ও সভার বিশিষ্ট অতিথি নাগাল্যান্ডের চীফ শ্রী নিকিত ইরালু ও অন্যান্য বক্তাগণ। এছাড়াও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া সানতালী রাইটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী রূপচাঁদ হাঁসদা, যদুমণি বেশরা, পঃ বঃ আসেকার সাধারণ সম্পাদক শ্রী দুখীরাম হাঁসদা, দাখিন মুরমু ও ভাষা মোর্চার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সমাবেশের প্রধান বক্তা শ্রী সালখান মুরমু বলেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভাষা ও লিপি আছে এবং তারা তাদের ভাষা ও লিপির মাধ্যমে পড়াশুনা করেন। যেমন পশ্চিমবাংলায় বাংলা, উড়িষ্যায় উড়িয়া, বিহারে দেবনাগরী ইত্যাদি। কিন্তু সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা ও লিপি থাকা সত্ত্বেও আজও কোন সাঁওতাল ছাত্র ছাত্রী তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ পায় নি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরও ভারত সরকার সাঁওতালী ভাষা ও লিপিকে আজও সংবিধানের ৮ম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করেননি। এ এক চরম অবিচার ও অসাংবিধানিক। তিনি আরো বলেন, আমরা জানি যে জাতি তার নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি সেই জাতির কোনদিন অর্থনৈতিক বিকাশ, রাজনৈতিক

বিকাশ, সামাজিক বিকাশ হয়নি। তিনি অবিলম্বে সাঁওতালী ভাষা ও লিপিকে সংবিধানের ৮ম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত ও নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যে "রাজভাষা" হিসাবে স্বীকৃতি দাবী করেন। তিনি আরও বলেন, যদি ভারত সরকার এই দাবী না মানেন তবে আগামী ৮ই ডিসেম্বর ২০০০ ভারতব্যাপী রেলের চাকা স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি ভারতবর্ষের প্রতিটি সুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট এই সাংবিধানিক ভাষা আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সমাবেশের বিশিষ্ট অতিথি শ্রী নিকিতু ইরাল বলেন, ভারত সরকার অনেক আগেই আদিবাসীদের "ঝাড়খণ্ড" রাজ্য দিয়ে দিতে পারতেন, সরকার দীর্ঘদিন আদিবাসীদের উপর অবিচার করে এসেছেন। ভারত সরকার দীর্ঘদিন পরে তার ভুলকে সংশোধন করার জন্য তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেন এবং তিনিও খুশী হয়েছেন। তিনি সাঁওতালী ভাষা মোর্চার সভাপতি শ্রী সালখান মুরমুকে নাগাবাসীদের পক্ষ থেকে একটি শাল উপহার দেন এবং নাগাল্যান্ডের আদিবাসীরা সালখান মুরমুর ভাষা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

**২ এবং ৩ ডিসেম্বর, ২০০০ ঃ**

জামশেদপুরে 'সারা ভারত লেখক সংঘে'র বর্ষপূর্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতেও সাঁওতালি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। একটি প্রতিবেদন —

রিপোর্টিং-

**[ আদিবাসী জগৎ। ১৬ ডিসেম্বর ২০০০ ]**

**লেখক সংঘের সম্মেলন হয়ে গেল**

জামশেদপুর। গত ২রা, ৩রা ডিসেম্বর ২০০০ জামশেদপুরের জন মাইকেল অডিটোরিয়ামে সারা ভারত সাঁওতালি লেখক সংঘের১৩ তম বর্ষপূর্তি সম্মেলন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনের উদ্বোধক ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার অবিসংবাদিত নেতা শিবু সরেন বলেন, আমরা দেশ পেলাম এবার ভাষার জন্য মিলিতভাবে জোরদার লড়াই করতে হবে। এই সম্মেলনে বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ২৫০ জনেরও বেশী প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে সাঁওতালী ভাষাকে ৮ম তপশীলে অন্তর্ভুক্তির জন্য জোর দেওয়া হয়। লেখক, সাংবাদিক, পুস্তক বিক্রেতা ও বিশিষ্ট গুণীজন ছাড়াও হাজার হাজার সাঁওতাল নর-নারী সম্মেলনে যোগ দেয়।

**৮ ডিসেম্বর ২০০৩ :**

সাঁওতালি ভাষার স্বীকৃতির দাবীতে সাঁওতালি ভাষা মোর্চার দিল্লী অভিযান।

**২০ ডিসেম্বর ২০০৩ :**

এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে মিটিং আহ্বান করা হয়। তাতে আলোচনার বিষয় হিসেবে আদিবাসী সংস্কৃতি থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী উপেন কিসকু সাঁওতালির সাংবিধানিক স্বীকৃতির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। শ্রী কিসকুর বক্তব্যের পক্ষে সাঁওতাল পরগণার M.P. জোয়াকিন বাকসলা সহ আরো অনেকেই সহমত পোষণ করেন।

**২১ ডিসেম্বর ২০০৩ :**

এ দিন সাঁওতালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে ও পক্ষে লোকসভার সাংসদ সালখান মুরমু জোরালো বক্তব্য রাখেন।

**২১ ডিসেম্বর ২০০৩ :**

সাঁওতালি ভাষার স্বীকৃতির দাবীতে আসেকার প্রতিনিধিদের দিল্লী অভিযান। উদ্দেশ্য বাসুদেব আচারিয়ার নেতৃত্বে ধর্ণায় বসা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন - দুখিরাম হাঁসদা, সুবোধ হাঁসদা, ভরত সরেন, সুধীর সরেন, সুরাই মুরমু, সুশান্ত হাঁসদা, গোপাল হাঁসদা ও হপনা কিস্কু।

তাঁরা ২১ ডিসেম্বর দিল্লীতে পৌঁছে যান এবং সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার কাছ থেকে জানতে পারেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সাথেই ২২ ডিসেম্বর ১২টা ১৫মিনিটে বৈঠকের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

**২২ ডিসেম্বর ২০০৩ :**

এই দিনের ঘটনা সম্পর্কে শ্রী সুবোধ হাঁসদা-র লেখা "সাঁওতালি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি" পুস্তিকা থেকে অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল —

২২শে ডিসেম্বর। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়ে পৌঁছে যান আসেকার নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসার কারণে ১২টা ৪৫মি. নাগাদ বৈঠকটি বসে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই জানিয়ে দেন, সাংসদ ছাড়া কোনো প্রতিনিধিদের সাথেই তিনি দেখা করবেন না। কিন্তু নাছোড়বান্দা বাসুদেববাবু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলে আসেন, সাংসদদের সাথে বহুবার এই দাবী নিয়ে

শুনেছেন। কিন্তু মাটির কাছের মানুষ, যাঁরা সক্রিয়ভাবে সামনে থেকে সাঁওতালি ভাষা আন্দোলনকে পরিচালনা করছেন, যাঁদের মাতৃভাষা সাঁওতালি সেই জনগণের মুখ থেকে আপনি অন্তত আজকে শুনুন। অন্তত দু'জন প্রতিনিধিকে আলোচনার সুযোগ দিন। বাসুদেব বাবুর এই জিদের কাছে মাথা নোয়ালেন প্রধানমন্ত্রী। চারজন সাংসদ যথা শ্রী বাসুদেব আচারিয়া, ডঃ রামচন্দ্র ডোম, অলকেশ দাস, রূপচাঁদ মুরমু সমেত মাত্র দুইজন আসেকার প্রতিনিধি শ্রী দুখিরাম হাঁসদা-সাধারণ সম্পাদক ও শ্রী সুবোধ হাঁসদা আসেকার সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও সাঁওতালি ভাষা কমিটি (পঃবঃ) সদস্যকে আলোচনার সুযোগ দেন।

সংবিধানের ১০০তম সংশোধনীতে কেবল বোড়ো ভাষাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে-এই আলোচনা সূচীই ওইদিন সংসদে উপস্থিত সাংসদদের দেওয়া হয়েছিল। আলোচনার শুরুতেই বাসুদেব বাবু বলেন-স্যার, সাঁওতালি ভাষায় এক কোটিরও বেশি লোক কথা বলেন। সাতটি রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা, ছত্তিশগড়, বিহারে, সাঁওতালিতে কথা বলে। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে সাঁওতালি দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা। এই ভাষার নিজস্ব লিপি আছে তার নাম অলচিকি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অলচিকিকে সরকারি লিপি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ১৯৭৯ সালে এবং সাঁওতালিতে মাধ্যমিক স্তরে পঠন-পাঠনও শুরু হয়েছে। এটা সাঁওতাল বিদ্রোহের মহান নেতা সিধু কানুদের মাতৃভাষা। এটা ভারতের অন্যতম প্রাচীন ভাষা। জনসংখ্যার নিরিখে ভারতে সাঁওতালি ভাষার স্থান ত্রয়োদশ। বোড়ো ভাষাকে আপনারা স্বীকৃতি দিচ্ছেন যদিও এই ভাষায় মাত্র ১৫ লাখ লোক কথা বলেন। অতএব স্যার, এই অধিবেশনেই ৮ম তফশীলে সাঁওতালিকেও অন্তর্ভুক্ত করুন। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন-বহুত দের হো গয়া। বাদমে দেখা যায়েগা। আসেকা প্রতিনিধি সুবোধ হাঁসদা বলেন-স্যার, সাঁওতালি ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা থেকেও প্রাচীন এবং ভারতীয় ভাষা ও সভ্যতার উন্নয়নে সাঁওতালি ভাষার বিশেষ অবদান আছে। সাঁওতাল জনগণ এখনও মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা পায়নি। তাই তাঁদের সাঁওতালিভাষী বিধায়ক ও সাংসদরা বিধানসভায় ও লোকসভায় সাঁওতালিতে কথা বলার সুযোগ পান না। কেউ আবেগবশত বললেও সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয় না, তখন আপনার মনের যেমন অবস্থা হবে আমাদের সাঁওতালিদের সেই অবস্থা অহরহ হচ্ছে। স্যার, দেশ আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মত দেখে। ৮ম তফশীলে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার জন্য আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার পাচ্ছি না। তাই সাঁওতালদের মধ্যে স্কুল ছুটের সংখ্যা অনেক বেশি। স্যার